আলী তানতাভী

শিশু-কিশোর সিরিজ

গল্পে আঁকা ইতিহাস-৭

মন্দীর ছেলে

ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী

অনূদিত

শিশু-কিশোর সিরিজ
গল্পে আঁকা ইতিহাস-৭

আলী তানতাভী

মন্ত্রীর ছেলে

অনুবাদ
ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী

ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলা বাজার, ঢাকা

শিশু-কিশোর সিরিজ

গল্পে আঁকা ইতিহাস-৭

লেখক : আলী তানতাভী
অনুবাদক : ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী ২০০৮ ঈ.

কিতাব কানন, দোকান নং- ৪০ (দোতালা), ১১ বাংলা বাজার ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং এশিয়াটিক সিভিল মিলিটারি প্রেস স্বামীবাগ ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

প্রচ্ছদ
বশির মেসবাহ

মূল্যঃ
৫০.০০ টাকা মাত্র

Shishu Koshur Series: Golpe Anaka Etihash- { History in drawn Story} by Ali Tantawi, Translated by Yahya Yusuf Nadwi, Published by : Kitab Kanan, Islami Towar, 11 Bangla Bazar, Dhaka. Price : $ 3 only £ : 2 only

শিশু-কিশোর সিরিজ

গল্পে আঁকা ইতিহাস-৭

মন্ত্রীর ছেলে

মন্ত্রীর ছেলে

এক যে ছিলো

তখন আব্বাসীয় খলীফা মুক্তাদিরের শাসনকাল চলছিলো। তাঁর মন্ত্রী সভার এক প্রভাবশালী সদস্য ছিলেন– আবদুল্লাহ্ আল-কাতিব। তিনি খলীফার খুব কাছের মানুষ ছিলেন। খলীফা সব সময় তাকে সঙ্গে রাখতেন। জরুরী রাজ-পরামর্শে শরীক রাখতেন। খলীফার ঘনিষ্ঠ মানুষ হওয়ার সুবাদে খলীফার পক্ষ থেকে মাঝে মধ্যেই লাভ করতেন তিনি মহামূল্যবান উপহার-সামগ্রী। রাজা-বাদশাদের উপহার– সে তো আর যেনতেন উপহার নয়! যে তা পায় তার ভাগ্য খুলে যায়। আবদুল্লাহ্ আল-কাতিবের ভাগ্যও খুলে গেলো। দেখতে দেখতেই তিনি বাগদাদের সেরা ধনীতে পরিণত হলেন।

প্রাসাদ কারে কয়!

বাগদাদের কথা তোমাকে আমরা আগেই বলে এসেছি। তখন বাগদাদ ছিলো পৃথিবীর সবচে' বড় শহর। সবচে' সুন্দর শহর। সেখানে বাস করতো বিশ লাখ মানুষ।

মন্ত্রী আবদুল্লাহ্ আল-কাতিব বাগদাদে নিজের জন্যে একটি প্রাসাদ

তৈরীর সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি এ উদ্দেশ্যে ডেকে আনলেন রাজ্যের সেরা সেরা নির্মাণ শিল্পীদের। জড়ো হলো শত শত রাজমিস্ত্রী। জোগাড় করা হলো যাবতীয় নির্মাণ-আয়োজন। তারপর একদিন শুরু হলো অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে প্রাসাদ নির্মাণের কাজ। দু' হাতে টাকা ঢাললেন মন্ত্রী।
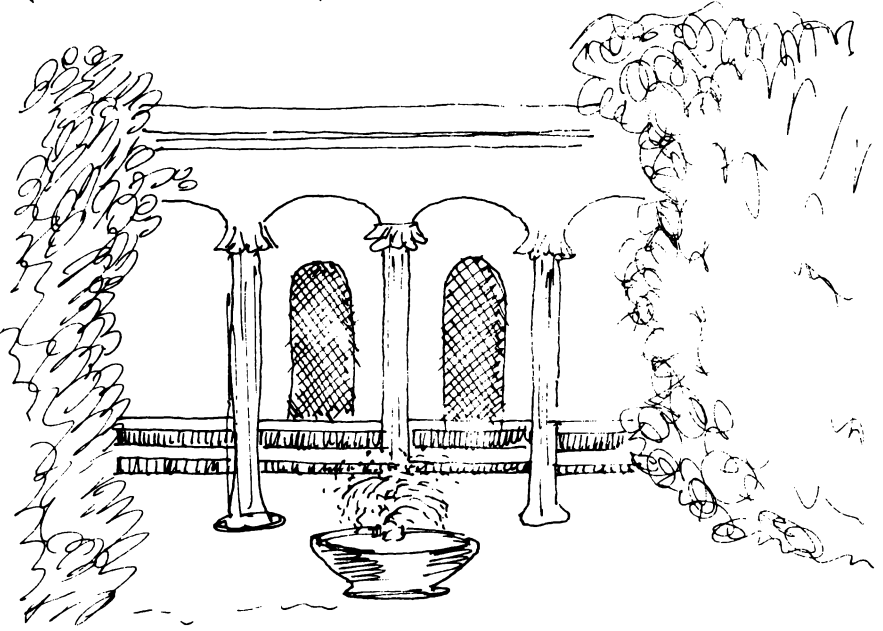
নির্মাণশিল্পীদের মাথা ঘামানো পরিকল্পনা আর শ্রমিকদের শরীর ঘামানো শ্রমে দেখতে দেখতেই একদিন তৈরী হয়ে গেলো দজলার কোল ঘেঁষে মন্ত্রীর স্বপ্নের প্রাসাদ, স্বপ্নপুরী। মুখোমুখি নির্মিত হলো মোট চারটি আলিশান ভবন। প্রতিটি ভবনের উপরেই শোভা ছড়াচ্ছিলো সুদৃশ্য উঁচু গম্বুজ। ভবনের অভ্যন্তর সাজানো হলো কারুকার্যময় সুপরিসর কামরায়। যেনো রাজপুরী। ঠিক মাঝ-আঙ্গিনায় স্থাপন করা হলো নজরকাড়া একটা হাউজ। সেখানে

সাঁতরে বেড়াচ্ছে দুর্লভ প্রজাতির রঙ-বেরঙের ছোট-বড় মাছ। হাউজ নির্মাণে ব্যবহার করা হলো দামী দামী সাদা-কালো-নীলাভ পাথর। হাউজের চারপাশে তৈরী হয়েছে– ফুলে ফুলে সুশোভিত, ঘ্রাণে ঘ্রাণে সুরভিত ছায়া সুনিবিড় দৃষ্টিকাড়া এক কুসুম কানন। এ ছাড়া উদ্যানের শেষ প্রান্তে দজলার তীরে বসানো হয়েছে সারি সারি আসন ও বেঞ্চি। তার একটু দূরেই তৈরী হয়েছে একটি ছোট্ট চিড়িয়াখানা। সেখানে রাখা হয়েছে দেশ-বিদেশের দুষ্প্রাপ্য ও অদ্ভুত সব পশু-পাখি।

এমনি আরো নানা সৌন্দর্য-উপকরণ দিয়ে সদ্য নির্মিত মন্ত্রীর এ-রাজপুরীটি যেনো দজলার তীরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছিলো! শোভা ছড়াচ্ছিলো!

মন্ত্রীর ছেলে

আবদুল্লাহ আল-কাতিবের স্ত্রী এক পুত্র সন্তান রেখে হঠাৎ চলে গেলেন। ভীষণ ভালোবাসতেন তিনি স্ত্রীকে। স্ত্রীর অকাল মৃত্যুতে তার প্রাসাদে নেমে এলো গভীর শোকের ছায়া। মন্ত্রী এখন নিঃসঙ্গ। একমাত্র ছেলে খালেদ ছাড়া কেউ নেই তাঁর। ছেলে খালেদই এখন তাঁর স্নেহ-মমতা ও ভালোবাসার কেন্দ্রবিন্দু। ছেলের জন্যে দ্বিতীয় বিবাহের চিন্তা পর্যন্ত তিনি করলেন না। ছেলেকে নিয়েই তিনি সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকলেন। স্ত্রীর শোক ভুলে থাকার চেষ্টা করলেন।

এভাবেই চলে যাচ্ছিলো ছোট্ট খালেদের সোনাঝরা রূপাঝরা দিনগুলো। কোনো কিছু তার চাইতে দেরী হতো কিন্তু পেতে দেরী হতো না। এভাবেই আদর দিয়ে স্নেহ দিয়ে ভালোবাসা দিয়ে মন্ত্রী

খালেদকে বড় করে তুলতে লাগলেন।

কিন্তু হলো কী জানো! ছেলের প্রতি তাঁর এই মাত্রাতিরিক্ত স্নেহ-মমতা ও ভালোবাসা– কর্তব্য পালনে তার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ালো। খালেদের প্রতি তাঁর সীমাহীন স্নেহ ছিলো কিন্তু কোনো শাসন ছিলো না। স্নেহে স্নেহে খালেদ ভীষণ আহ্লাদী ও বাঁধনহারা হয়ে উঠলো। শাসনের অভাবে অভাবে খালেদ ভড়কে যেতে লাগলো। এদিকে মন্ত্রী পুত্রস্নেহে এতোটাই 'আক্রান্ত' ছিলেন যে, তাঁর স্বাভাবিক বুদ্ধি-বিবেচনা পর্যন্ত ঠিকমতো কাজ করছিলো না। ছেলেকে পাঠশালায় পাঠানোও যে ভালোবাসারই অংশ, তাও তিনি সময় মতো বুঝলেন না। এমনকি বাড়িতেও তিনি ছেলের জন্যে পড়াশুনার ব্যবস্থা করলেন না। একজন আদর্শ পিতার দায়িত্ব পালনে তিনি সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হলেন।

সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্ম-নেয়া খালেদের মুখ থেকে সোনার চামচটা তখনো নামালো না, যখন বয়ে যাচ্ছিলো তার পাঠশালে যাওয়ার শ্রেষ্ঠ সময়টা। মন্ত্রী তখন অবিবেচকের মতো ছেলের সামনে ধন-সম্পদের দরোজা খুলে দিলেন। বললেন– 'প্রিয় পুত্র! আমার মানিক! এ-অঢেল ধন সম্পত্তির তুমিই মালিক। আমার কাছে তুমি যখন যা চাইবে, তাই পাবে।'

এ ভাবেই আরাম-আয়েশ আর ভোগ-বিলাসের ভিতরে খালেদ বেড়ে উঠছিলো। বাবার কাছে যখন যা আবদার করছিলো, মুহূর্তেই তা তার হাতের মুঠোয় চলে আসছিলো। কিন্তু বিদ্যা-বুদ্ধির বেলায় খালেদ ছিলো একদম শূন্য। তার বিদ্যা লাভের মানসিকতা, ইলম হাসিলের ইচ্ছা– সব ঢাকা পড়ে গেলো অস্বাভাবিক পিতৃস্নেহের নীচে। পিতার অঢেল ধন-সম্পদের নীচে। তাই পূর্ণ যৌবনে

পৌঁছেও খালেদ থেকে গেলো প্রায় গণ্ড মুর্খই। আর জ্ঞান-বুদ্ধি না থাকায় এই অঢেল ধন-সম্পদই তার কাল হয়ে দাঁড়ালো। সীমাহীন প্রাচুর্যের ভিতরে দাঁড়িয়ে সে ব্যর্থ হলো সত্য ও মিথ্যার এবং ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য করতে। নিরক্ষর মূর্খ ধনী খালেদের জন্যে তাই সামনে অপেক্ষা করছিলো এক অনিশ্চিত অন্ধকার ভবিষ্যত।

প্রাসাদের 'অন্ধকার'

খালেদের বাবা দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছেন। ছেলের জন্যে রেখে গেছেন অঢেল সম্পদ আর রাজকীয় এ-প্রাসাদ।

খালেদ এখন পূর্ণ যুবক!

তার হাতের নাগালে এখন অঢেল ধন-সম্পদ!

এবং অখণ্ড অবসর!

ইতিহাস বড়ো অকপটে যে 'নিষ্ঠুর সাক্ষ্য'টা দিয়েছে, তা হলো– যার মধ্যে 'যৌবন, সম্পদ ও অখণ্ড অবসর'– এ তিনটি জিনিস এক সঙ্গে পাওয়া যাবে, তা তৃতীয় আরেকটি জিনিসকে ডেকে আনবেই। আর এ-তৃতীয় জিনিসটি হলো– 'নৈতিক অবক্ষয় ও চারিত্রিক ধ্বংস'।

এক আরব কবির ভাষায়–

'যৌবন, অবসর আর সম্পদ– মানুষের জন্যে ডেকে আনে ধ্বংস, নিশ্চিত ধ্বংস।'

খালেদের মাঝেও যখন এ তিনটি জিনিস একসঙ্গে জমা হলো, তখন তার ঘাড়েও শয়তান চেপে বসলো। যতো সব মন্দ কাজ, যতো সব অন্যায় কাজ, শয়তানের প্ররোচনায় তা-ই হয়ে উঠলো

খালেদের সামনে মোহনীয়, শোভনীয়। কু-প্রবৃত্তির অসুন্দর পৃথিবী খালেদকে হাতছানি দিয়ে ডাকলো। অজ্ঞ খালেদ সে ডাকে সাড়া দিলো– ব্যাকুল হয়ে, অস্থির হয়ে, বল্গাহারা হয়ে। অসুন্দরকে সুন্দর ভেবে। কালোকে সাদা মনে করে।

ইবলিসের দেখানো পথেই বিস্ময়ভরা দৃষ্টি নিয়ে চলতে লাগলো খালেদ। যেনো রোমাঞ্চকর কোনো অভিযাত্রায় বেরিয়েছে সে। কোথাও একটু থামলোও না। একটু ভেবেও দেখলো না– কোথায় চলেছে সে এবং কেনো চলেছে?

ধীরে ধীরে পাপময় জীবনের অন্ধকারে ডুবে যেতে লাগলো খালেদ। শয়তানও তাকে নষ্ট করার জন্যে শয়তানের মতোই সামনে এগিয়ে এলো। কিন্তু শয়তান তো আর সরাসরি খালেদের কাছে আসবে না! তাই মানুষের ভিতর থেকেই তার এক শিষ্যকে নিয়োজিত করলো– খালেদকে নষ্ট পথের ঠিকানা বলে দেয়ার জন্যে।
কে ছিলো এই মানুষরূপী শয়তান?

এ-শয়তানটার নাম ছিলো যিয়াদ। যিয়াদ দুরভিসন্ধি ও খারাপ নিয়তে মানুষের মাঝে ঘুরে বেড়াতো আর উপযুক্ত শিকার খুঁজে ফিরতো। ধনীর দুলালরাই ছিলো তার মূল শিকার। যখনই সে খালেদের মতো কোনো ধনীর দুলালের সন্ধান পেয়ে যেতো, তখনই সে তার পিছু নিতো। তারপর গল্পচ্ছলে তার কাছ ঘেঁষে বসতো। ভাব জমাতো। সুযোগ মতো তার সামনে মেলে ধরতো পাপ জগতের রঙ্গিন রঙ্গিন ছবি এবং সারাক্ষণ তার সাথে লেগে থাকতো জোঁকের মতো আর শুষে নিতে থাকতো তার টাকা-পয়সা। ধ্বংস করে দিতো তার স্বভাব-চরিত্র।

এভাবে শিকারকে পুরোপুরি শিকার করে অর্থাৎ তার সর্বস্ব লুটে

নিয়ে সে তাকে ছেড়ে দিতো এবং নতুন শিকারের খোঁজে বেরিয়ে পড়তো। এই হলো যিয়াদরূপী শয়তানদের কাজ। এ যিয়াদরা মানুষের সমাজে সব সময় ছিলো আছে এবং থাকবে। কখনো থাকে প্রকাশ্যে, কখনো থাকে ঘাপটি মেরে।

যিয়াদ প্রতিদিনই খালেদের সামনে পাপের নতুন নতুন দরোজা খুলে দিচ্ছিলো। প্রথমে সে তাকে সঙ্গীত ও গানের ভক্ত বানালো। তাকে নিয়ে গেলো যাত্রাগানের আসরে। এ-সব আসরে যাতায়াত শুরু হওয়ার পর খালেদ দ্রুত বদলে যেতে লাগলো। এখানে এসেই সে মদ ধরলো। নারী-সঙ্গে আসক্ত হলো।

আসলে এ-সব আসর ছিলো তখন (এখনো) খারাপ লোকদের আড্ডা। দুষ্ট লোকদের আখড়া। আর এদের আড্ডা ও আসর তো মদ ছাড়া 'জমেই উঠে না'।

এ ছাড়া যিয়াদ খালেদকে নিয়ে পরিচয় করিয়ে দিলো তার খারাপ প্রকৃতির, নষ্ট চরিত্রের সব আজেবাজে বন্ধুদের সাথে। আর জানোই তো, ভালো বন্ধু মানুষকে নিয়ে যায় ভালোর দিকে আর খারাপ বন্ধু নিয়ে যায় খারাপের দিকে। যিয়াদের বন্ধুরা কেমন ছিলো তা তো এই যিয়াদকে দিয়েই বিচার করা যায়! তারা মোটেই বড় বড় আলেম ছিলো না। বড় বড় মুহাদ্দিস ছিলো না। বড় বড় আল্লাহ্র ওলী ছিলো না। বরং তারা ছিলো শয়তানের বন্ধু– সাক্ষাত চেলা।
এভাবে খালেদের দিকে ধেয়ে আসতে লাগলো একের পর এক বিপদ।
প্রথম বিপদ– যিয়াদ।
দ্বিতীয় বিপদ– যাত্রাগানের আসর।
তৃতীয় বিপদ– যিয়াদের আজেবাজে বন্ধুরা।
আর চতুর্থ মহা বিপদটা অপেক্ষা করছে এই সামনেই।

শিল্পী ও যিয়াদ

আরেক ধাপ সামনে বাড়লো যিয়াদ। এবার সে খালেদকে পরিচয় করিয়ে দিলো সঙ্গীত শিল্পী ও গায়িকাদের সাথে।

আমরা যে সময়ের যথা বলেছি, সে সময় এ-সব সঙ্গীত শিল্পী ও গায়িকাদের সংখ্যা ছিলো হাজারে বিজারে। তাদের চাহিদা ও বাজারও ছিলো বেশ রমরমা। তাদের নিয়ে চলতো 'লাভজনক' ব্যবসা। পণ্য হিসাবে এ-সব নর্তকী ও গায়িকাদের মূল্য ছিলো বেশ চড়া। 'ব্যবসায়ীরা' রোমান, গ্রীক, তুর্কী ও বলকান অঞ্চলের নজরকাড়া সুন্দরীদের কিনে আনতো নামমাত্র মূল্য দিয়ে। পাঁচশ সাতশ দিরহাম দিয়ে। তারপর চলতো প্রশিক্ষণের মহড়া ও কসরত, যার লক্ষ্য ছিলো– সঙ্গীত ও নৃত্যের ভিতর দিয়ে মানুষকে পাপ-আসক্ত ও বিপথগামী করা, ধর্মবিমুখ করা। বিজাতীয় অপসংস্কৃতির দিকে ঠেলে দেয়া। শুধু তাই নয়, মানুষের স্বভাব-চরিত্র ধ্বংস করার জন্যে যা যা করা দরকার– সবই তাদের শেখানো হতো। সবকিছু হয়ে যাওয়ার পর তাদেরকে সুসজ্জিতরূপে উপস্থাপন করা হতো 'মানুষ-ক্রয়-বিক্রয়' বাজারে। তখন এদের 'পণ্যমূল্য' এতো বেড়ে যেতো যে, কার আগে কে কিনবে– এ নিয়ে পুরা দস্তুর প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যেতো। তখন সেই পাঁচশ সাতশ টাকার গায়িকা ও নর্তকীর মূল্য গিয়ে দাঁড়াতো কখনো কখনো এক লাখে, দুই লাখে।

হ্যাঁ, এইসব গায়িকা ও নর্তকীদের বিষাক্ত মায়ায় জড়িয়েই এখন খালেদের সকাল-সন্ধ্যা কাটে। এদের বিষমাখা কৃত্রিম ভালোবাসার মায়াজালে আটকা পড়েই শুষ্ক পাতার মতো উড়ে যাচ্ছে খালেদের ধনাগারের দিরহাম-দিনার। ধ্বংস হচ্ছে তার স্বভাব-চরিত্র ও শরীর-স্বাস্থ্য।

আসলে খালেদ যে পথে নেমেছে, এ পথে নামলে এমন পরিণতি থেকে কেউ বাঁচতে পারে না। শুধু খালেদ কেনো; যে যুবকই, যে মানুষই আল্লাহ্র নাফরমানীর অন্ধকারে ডুব দেয়, সে যুবকই শেষ পর্যন্ত হারায় নিজের স্বাস্থ্য ও চরিত্র। নিজের দৌলত ও অর্থ। নিজের দ্বীন ও আকিদা। ইতিহাস বড়ো অকৃপণভাবে এ-সত্য কথাটা বারবার আমাদেরকে বলে চলেছে ।

পাপ ও অপরাধ কী? কেনো এবং কীভাবে তা মানুষের স্বভাব-চরিত্র ও ধন-সম্পদ নষ্ট করে দেয়? জানতে চাও? বলছি– পাপ ও অপরাধ হলো এমন একটা গ্লাসের মতো, যার উপরিভাগে রয়েছে দারুণ সুমিষ্ট শরবত কিন্তু নীচের ভাগে রয়েছে বিষ– মৃত্যু ডেকে আনে যে বিষ! সুতরাং যে ব্যক্তি প্রতারিত হয়ে নীচের বিষাক্ত অংশের কথা চিন্তা না করে উপরের সুমিষ্ট অংশ পান করতে শুরু করবে এবং এক নিঃশ্বাসেই সাবাড় করে ফেলবে পুরো গ্লাস, তাহলে বলো– কী হবে তার পরিণতি? সে কি বাঁচতে পারবে মৃত্যুর হাত থেকে? মৃত্যু কি কেড়ে নেবে না– তার সবুজ কোমল তাজা প্রাণটা?

খালেদের রঙমহল

যিয়াদ খালেদকে যখনই পাপময় জগতের নতুন কোনো ঠিকানা বলে দিতো, তখনোই সে বিনিময়ে খালেদের কাছ থেকে ফুসলিয়ে-ফাসলিয়ে মোটা অঙ্কের 'পুরস্কার' হাতিয়ে নিতো। মজার ব্যাপার হলো, যিয়াদ দশ দিরহাম চাইলে খালেদ তাকে বিশ দিরহাম দিয়ে দিতো। এভাবে খালেদ নিজেকে নিয়ে ডুব দিলো পাপ ও গোনাহ্র অপরিচ্ছন্ন জগতে। নিজের ধন-সম্পদ ও সুন্দর- সুকুমার জীবন নষ্ট করে করে।

কোনো ভুখা ও ক্ষুধার্ত মানুষ যদি সামনে মজাদার কোনো খাবার পেয়ে যায়, তার পেটে তখন রাজ্যের ক্ষুধা এসে যেমন ভিড় জমায়, ঠিক তেমনি খালেদের টাকা-পয়সা ও ধন-সম্পদ দেখেও এর প্রতি যিয়াদের ক্ষুধা দিনে দিনে বাড়তে লাগলো। কী করে অতি তাড়াতাড়ি খালেদের সমস্ত সম্পত্তি হাতিয়ে নেয়া যায়, এ নিয়ে তার ফন্দি-ফিকির ও পরিকল্পনার কোনো সীমা ছিলো না। প্রায় প্রতিদিনই সে খালেদের সামনে নিত্য নতুন প্রস্তাব নিয়ে হাজির হতো। কেমন সে সব প্রস্তাব? পাপের প্রস্তাব! অপরাধে লিপ্ত হওয়ার প্রস্তাব! পাপের পথে হেঁটে হেঁটে দূর অজানায় হারিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব! একটা নমুনা দেখো–

একদিন খালেদের সামনে এক রোমান কণ্ঠশিল্পীকে নিয়ে হাজির হলো যিয়াদ। বয়স আর কতোই বা হবে? আঠারো কি ঊনিশ! কিন্তু বয়স কম হলে কী হবে? ইবলিসের পাঠশালার সকল পাঠই তার পড়া হয়ে গিয়েছিলো। মানুষকে বিভ্রান্ত ও বিপথগামী করার এবং সত্য, সুন্দর ও ন্যায়কে ধ্বংস করার যাবতীয় কৌশল ও পন্থাই তার নখদর্পণে ছিলো।

কেমন ছিলো সে রোমান গায়িকা? সে দেখতে খুব সুন্দর হলে কী হবে, ভিতরটা ছিলো ভীষণ অসুন্দর, কুৎসিত। তার রূপ ছিলো দৃষ্টিকাড়া আর চরিত্র ছিলো পাপে ভরা, আঁধারঘেরা। তার দেহ থেকে ছড়াতো সুঘ্রাণ, আর স্বভাব-চরিত্র থেকে ছড়াতো দুর্গন্ধ। তাকে জোগাড় করেছে যিয়াদ– নৃত্য ও সঙ্গীতের মোহনীয় ছলনায় খালেদকে মুগ্ধ করে, আকৃষ্ট করে নষ্ট পৃথিবীর আঁধারে ঠেলে দিয়ে তার সমস্ত ধন-সম্পদ চুষে নেয়ার হাতিয়ার হিসাবে। ফিসফিস করে যিয়াদ এ-গায়িকাকে বলেই রেখেছিলো– 'যেভাবে পারো

খালেদকে বশ করো। তারপর হাত করো তার গুপ্ত ভাণ্ডারের চাবি। শিল্পী! যদি তুমি পারো তাহলে তোমাকে আমি পুরস্কৃত করবো!'

এরপর যিয়াদ দু'জনকে একান্তে ছেড়ে দিলো। আর ইবলিস এদেরকে নিয়ে খেলতে লাগলো পুতুল বানিয়ে। খালেদ ছুটে যেতে লাগলো অকল্পনীয় ও অনিবার্য পরিণতির দিকে।

সকাল বেলার আমীর যখন সন্ধ্যাবেলার ফকীর!

যিয়াদ তাকে নিয়ে কী খেলায় মেতে উঠেছে তা খালেদ বুঝলো না। কেননা ও ছিলো অজ্ঞ ও অপরিণামদর্শী। তাই রোমান কণ্ঠশিল্পীকে কাছে পেয়ে ভাবলো— আকাশের চাঁদটাই বুঝি ওর হাতের নাগালে চলে এসেছে। অথচ এ ছিলো খালেদকে নিঃস্ব করার এক গভীর ষড়যন্ত্র। না বোঝে না জেনে বোকা খালেদ পা দিলো সর্বস্ব কেড়ে-নেয়া এ-ফাঁদে। খালেদ মুগ্ধ বিস্ময়ে কণ্ঠশিল্পীর উন্মাতাল নাচ-গানে ডুবে গেলো।

কণ্ঠশিল্পী গানে গানে আর নাচে নাচে খালেদকে পাগল করার পর এবার তার রূপ-ঝলকে খালেদকে পাগল করতে চাইলো, বরং ভস্ম করে দিতে চাইলো। খালেদও পতঙ্গের মতো তার রূপের দিকে ধেয়ে যেতে চাইলো। কিন্তু 'রোমান- কণ্ঠশিল্পীটি ছিলো আসলে একটা আস্তো ডাইনী। সে বললো—
'প্রিয় খালেদ! আমি তোমারই! তবে আমি বড়ো দামী! আমাকে পেতে চাইলে আমার পায়ের কাছে ঢালতে হবে— কাড়ি কাড়ি আশরাফী!

খালেদ আবারো বিভ্রান্ত হলো। খালেদ কণ্ঠশিল্পীর ধারণার চেয়ে আরো বেশী স্বর্ণমুদ্রা এনে ঢেলে দিলো তার পায়ে! কিন্তু মায়াবিনী

ডাইনী খালেদকে দিতো না কিছুই। পাওয়ার লোভে দেখাতো শুধু দেয়ার লোভ। অর্থাৎ খালেদের পিপাসা বাড়িয়ে দিতো। ডাইনীরা এমনই হয়। ডাইনীদের খপ্পড়ে যে-ই পড়েছে সে-ই সব হারিয়েছে। খালেদেরও তাই রেহাই নেই।

খালেদের অবস্থা এখন কী?
মোটেই ভালো না।
তার সকাল কাটে এখন এ-রোমান শিল্পীর 'চাঁদমুখ' দেখে।
সন্ধ্যা কাটে তার গান শুনে শুনে।
আর রাত কাটে আরো অসুন্দরভাবে।
অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে।
রোমান গায়িকার অপরিচ্ছন্ন সান্নিধ্যে।
খালেদের চোখে এখন পৃথিবীর সব সুন্দরই অসুন্দর–
এ-নারীর সৌন্দর্য ছাড়া।

এ-ডাইনী গায়িকার 'ভালোবাসা' ও নৈকট্য ছাড়া এখন খালেদের আর কিছুই চাওয়ার নেই।

এ-ছলনাময়ী নারীর কৃত্রিম ভালোবাসার ঝরনায় খালেদ যখন আনন্দ-বিভোর হয়ে সাঁতার কাটছিলো, তখনই তার মাথায় পড়লো এসে বাজটা। জ্বলে উঠলো মহা বিপদ সঙ্কেতটা। প্রতিদিনের মতো কণ্ঠশিল্পীকে স্বর্ণমুদ্রা দিতে গিয়ে একদিন খালেদ দেখতে পেলো যে, তার ধন-ভাণ্ডার খালি! দিতে দিতে সব শেষ! কিন্তু এতো তাড়াতাড়ি! এতো তাড়াতাড়ি তো এতো স্বর্ণমুদ্রা শেষ হতে পারে না! কণ্ঠশিল্পীর কৃত্রিম ভালোবাসার ইন্দ্রজালে আটকা-পড়া খালেদ কিছুই বুঝে উঠতে পারলো না।

এ-গায়িকা কীভাবে খালেদকে এমন পাগল করলো?

কীভাবে অল্প দিনেই তার ধন-ভাণ্ডার খালি করে ফেললো?
বন্ধু! এ প্রশ্নের উত্তরটা জানতে চাও?
জেনে নাও!
কেননা–
ঐ চপল নারীর ঠোঁটে ছিলো– শিশুর নির্মল হাসি!
ঐ ছলনাময়ীর চোখে ছিলো– ছল-করা অশ্রু!
ঐ মায়াবিনীর ডাকে ছিলো– মন পাগল-করা আবেদন!
ঐ কুহকিনীর জালে ছিলো– চুম্বকের আকর্ষণ!
এ হাসিতে
এ অশ্রুতে
এ আবেদনে
এ আকর্ষণে খালেদ বিভ্রান্ত হয়ে গেলো!
শুধু খালেদ কেনো? যে কোনো মানুষই বিভ্রান্ত হয়!
ভাবতে বাধ্য হয়–
আহা! নারীর মন কী নম্র ও পবিত্র!
আহা! নারীর হাসি কী নির্মল ও স্বচ্ছ!
আহা! তার অশ্রুতে কেমন বেয়ে পড়ছে–
নারীর চিরন্তন মায়া-মমতা-ভালোবাসা!!
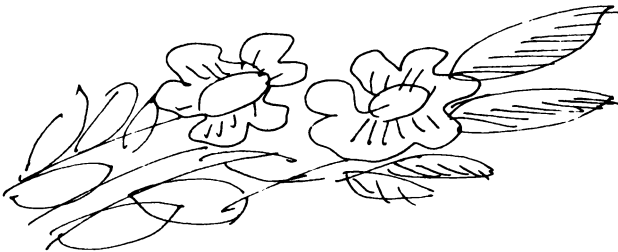
হ্যাঁ বন্ধু! নারীর এ-ছলনাই খালেদকে বন্দি করে ফেলেছিলো। সবকিছু কেড়ে নিয়েছিলো। বাগদাদের সবচে' সুন্দর প্রাসাদে বেড়ে উঠা খালেদকে অবিশ্বাস্যভাবে পথের ভিখারী বানিয়ে দিয়েছিলো।

তবু মন কাঁদে তার জন্যে!
অদ্ভুত, বড়ো অদ্ভুত!!

কিন্তু এতেও খালেদের শিক্ষা হলো না। হুঁশ হলো না। শুভ বুদ্ধির উদয় হলো না। এবার সত্যি সত্যি আমীরের হলো ফকীরের বেশ। শুরু হলো মানুষের কাছে হাত পাতা। এভাবে সে অনেক টাকা ঋণ করলো। আর মানুষও তাকে চাইতেই দিয়ে দিতো এই ভেবে যে- খালেদ তো এখনো অনেক সম্পদের মালিক। এখনো বাগদাদের সবচে' সুন্দর প্রাসাদের অধিপতি!
মানুষের কাছে ঋণ নিয়ে নিয়ে খালেদ সবই কিন্তু সেই রাক্ষুসীর পায়ে ঢালতো।

খালেদের জন্যে ভীষণ আফসোস হয়! হায়রে বোকা খালেদ! কেনো যে বুঝলে না- ভালোবাসা এমন কোনো পণ্য নয় যে, তুমি দিরহাম-দিনার দিয়ে তা কিনে ফেলবে! এখনো তুমি ঋণ করে করে ঐ পিশাচিনীর পায়ে ঢালছো, তোমার কি সুমতি হবে না?

কিন্তু ততোদিনে মানুষের কাছে খালেদ-রহস্য ফাঁস হয়ে গেলো। এতোদিন যারা বোকার মতো খালেদকে ঋণ দিয়ে এসেছিলো, তারা জেনে ফেললো খালেদের নিঃস্বতা ও দারিদ্রের কথা। আর তার কারণটা জেনে ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো তারা। আর এক মুহূর্তও খালেদকে ছাড় দিতে তারা রাজি হলো না। দল বেঁধে সবাই এসে জড়ো হলো প্রাসাদের আঙ্গিনায়। সেখানে মেষ শাবকরা ঘুরে

ঘুরে ঘাস খাচ্ছিলো, সব তারা ধরে নিয়ে গেলো। জবাই করে তার গোশত ও চামড়া বিক্রি করে ফেললো। কিন্তু এতেও তাদের পাওনা উসুল হলো না। অবশিষ্ট পাওনা উসুল করার জন্যে আবার তারা খালেদের প্রাসাদের সামনে এসে জড়ো হলো এবং খালেদকে ঘিরে ধরলো। কিন্তু কোত্থেকে দেবে খালেদ তাদের পাওনা? অধোমুখে দাঁড়িয়ে থাকা খালেদের দিকে রক্তচোখে তাকিয়ে জনতা তখন স্বরোষে বললো–

'দেখো খালেদ! তুমি যদি আমাদের পাওনা আদায়ে ব্যর্থ হও, তাহলে আমরা এক্ষুণি তোমার প্রাসাদের দরোজাগুলো খুলে খুলে নিয়ে যাবো এবং তা বিক্রি করে আমাদের পাওনা উসুল করে নেবো!'

খালেদের নীরবতায় তারা তখন সত্যি সত্যি প্রাসাদের সমস্ত দরোজা খুলে নিয়ে বিক্রি করে দিলো। খালেদের স্বপ্নের প্রাসাদের উপর দিয়ে যেনো মুহূর্তেই বয়ে গেলো প্রচণ্ড একটা ঘূর্ণিঝড়। সাজানো গোছানো নয়নাভিরাম প্রাসাদটাকে দেখলে এখন বোঝাই মুশকিল– কয়েক ঘন্টা আগেও এ ছিলো বাগদাদের সৌন্দর্য-মণি।

কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, এ-সব খালেদকে তেমন একটা আঘাত করলো না। তার জন্যে সবচে' বড় আঘাতটা ছিলো– সেই রোমান কণ্ঠশিল্পীর না বলে না কয়ে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যাওয়া! একদিন খালেদ দেখতে পেলো– তার ভালোবাসার মানুষ তার ঠিকানা ফেলে চলে গেছে অজানা ঠিকানায়। যার জন্যে আমীর আজ নিঃস্ব, সেই মানুষটাই এই অবেলায় তাকে না বলে পালিয়ে গেলো!

কেনো এমন হলো? এমন হওয়ারই কথা ছিলো। কারণ ঐ রোমান শিল্পী তো খালেদকে পেতে আসে নি! সে এসেছিলো খালেদের

স্বর্ণমুদ্রা পেতে! তার উদ্দেশ্য যখন পুরোপুরি হাসিল হয়ে গেলো, তখন কেনো সে খালেদের সান্নিধ্যে পড়ে থেকে খালেদের দুর্দশা ও দারিদ্র দেখবে?

খালেদ ভেবেছিলো তাকে হৃদয়ের রানী।
আসলে সে ছিলো হৃদয়-সংহারী!
অর্থলোভী! ডাইনী! পিশাচিনী! মায়াবিনী! ছলনাময়ী! কুহকিনী! ভালোবাসার অভিনয় করে এসেছিলো সে সম্পদ চুষতে। সম্পদ-চোষা শেষ! অভিনয়ের পালাও শেষ! ইস! বেচারা খালেদের এখন কী করুণ অবস্থা! দ্বীনও নেই, দুনিয়াও নেই! ভালোবাসাও নেই, সম্পদও নেই! যিয়াদও নেই, স্বপ্নের সেই 'রানী'ও নেই! আছে কেবল দারিদ্র ও হতাশা! কেনো আসবে এখন যিয়াদ? এখন তো তার 'আম্রকাননে' পাখিরা আর গান গায় না! প্রজাপতিরা আর উড়ে বেড়ায় না! কেনো থাকবে ঐ রোমান শিল্পী? এখন তো খালেদের কাছে সোনার আশরাফির আলো নেই! তার ঝনাৎ ঝনাৎ শব্দ নেই!

আসলে এটাই সেই পথের শেষ ঠিকানা, যে পথের যাত্রী হয়েছিলো– অবুঝ মূর্খ খালেদ! এক আরব কবি এই খালেদদের লক্ষ্য করেই উচ্চারণ করেছেন–

'আমাদের কাজে লাগবে– এমন বিদ্যা-বুদ্ধিও যদি তোমার না থাকে, দ্বীনদারীও যদি তোমার জীবনকে আলোকিত করতে না পারে, আমাদের বিপদ-আপদেও যদি তুমি এগিয়ে না আসো, তবে তোমাকে মাটির তৈরী এক 'পুতলা' ছাড়া আর কী ভাবতে পারি?

একটি অপ্রত্যাশিত সাক্ষাত

অনেক দিন পরের কথা। খালেদের কথা অর্থ-পিশাচ যিয়াদ একদম ভুলেই গিয়েছে। যেনো খালেদ নামে যিয়াদ কাউকে কোনোদিন চিনতোই না। কিন্তু যিয়াদের শয়তানী অভ্যাসটা এখনো দূর হয় নি। ঠিক আগের মতোই এখনো সে বোকা-সোকা খালেদদের খুঁজে বেড়ায়। আর খালেদরাও যিয়াদদের হাতে ধরা দেয় অনায়াসে, ক্ষণিকের চোখ-ঝলসানো ও মন-ভোলানো রূপ-সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে, কৃত্রিম ভালোবাসার ছল-করা অশ্রু কিংবা মিষ্টি হাসির দুষ্ট ছবিতে প্রতারিত হয়ে। তারপর কী হয়? তারপর তারা যিয়াদদের পায়ে ঢেলে দিতে থাকে সব। একেবারে দারিদ্রের আগুনে হাত না পুড়া পর্যন্ত।

বসন্তের এক সুন্দর সকালে যিয়াদ প্রমোদতরী নিয়ে বাড়ি ফিরছিলো। দজলার ঢেউয়ের সাথে পাল্লা দিয়ে দিয়ে বেশ হেলে দোলে চলছিলো তার প্রমোদতরীটি। এক সময় খালেদের প্রাসাদের একেবারে কোল ঘেঁষেই তরতর করে এগিয়ে যাচ্ছিলো তরীটি। যিয়াদ দেখলো– দজলার থই থই পানিতে কাঁপছে প্রাসাদের প্রতিবিম্বটা। যেনো দজলার পানিতে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে প্রতিবিম্বটা অবগাহন করছিলো। কিংবা অবগাহনের স্বপ্নে বিভোর ছিলো।

বন্ধু! আমি বারবার 'দজলা দজলা' করছি, কিন্তু এখনো তোমাকে দজলার কথা কিছুই বলা হয় নি। দজলার কথা কী আর বলবো! এই দজলা প্রবাহিত হয়ে চলেছে সেই কতোকাল ধরে! এই দজলা সাক্ষী হয়ে আছে কতো জীবন-মৃত্যুর! এই দজলার বুকে লুকিয়ে আছে ভাঙা-গড়া ও উত্থান-পতনের দীর্ঘ ইতিহাস! এখানে আরো

লুকিয়ে আছে কান্না-হাসির কতো গল্প, সুখ-দুঃখের কতো কাহিনী! যুগ-যুগান্তরের কতো অবিবৃত কথা ও কাহিনী! তুমি মুখে বাগদাদ উচ্চারণ করবে আর দজলা-ফোরাতের ছবিটা তোমার চোখের সামনে ভেসে উঠবে না– এ হতেই পারে না!

বড় হয়ে দজলা সম্পর্কে আরো অনেক কিছুই তুমি জানতে পারবে। আমি তোমাকে এখানে আর কিছু বলবো না। ফিরে যাবো আবার যিয়াদের প্রমোদতরী এবং খালেদের কথায়।

খালেদের শ্রী-হীন প্রাসাদের উপর দৃষ্টি পড়তেই যিয়াদের মনে ভেসে উঠলো পুরোনো দিনের অনেক স্মৃতি! খালেদের ছবি! হঠাৎ যিয়াদ স্বভাব-বিরোধী সিদ্ধান্ত নিলো। কী জানি কী ভেবে সে তরীটা খালাদের প্রাসাদের ঘাটে ভিড়ালো। যিয়াদ জানে– এখন খালেদের কাছ থেকে তার পাওয়ার কিছু নেই। তবুও কেনো সে আজ তরী ভিড়ালো? হ্যাঁ, যিয়াদের তো এমনটি করার কথা না! হয়তো সে দেখতে চায়– খালেদ কেমন আছে। খালেদ দারিদ্র ও নিঃস্বতার কোন্ স্তরে বসবাস করছে। যিয়াদ ভিতরে প্রবেশ করলো। হায়! এ কী অবস্থা? একদিন যে প্রবেশদ্বার প্রহরী ও দারোয়ানদের ব্যস্ত আনাগোনায় মুখর ছিলো, আজ সেখানে বিরাজ করছে 'কবরের নীরবতা'। খা খা শূন্যতা। কোথাও নজরে পড়ছে না জন-মানুষের কোনো চিহ্ন। গাছ-গাছালিতে পাখ-পাখালিরা কি কূজন করতেও ভুলে গেছে? আঙ্গিনা জুড়ে পড়ে আছে ময়লা আবর্জনা। আসন ও বেঞ্চিগুলোয় পড়েছে স্যাঁতস্যাতে শেওলা। যে আঙ্গিনায় সৌরভ ছড়াতো জানা অজানা অসংখ্য ফুল, আজ সেখানে ফুলের কোনো চিহ্নই চোখে পড়ছে না।
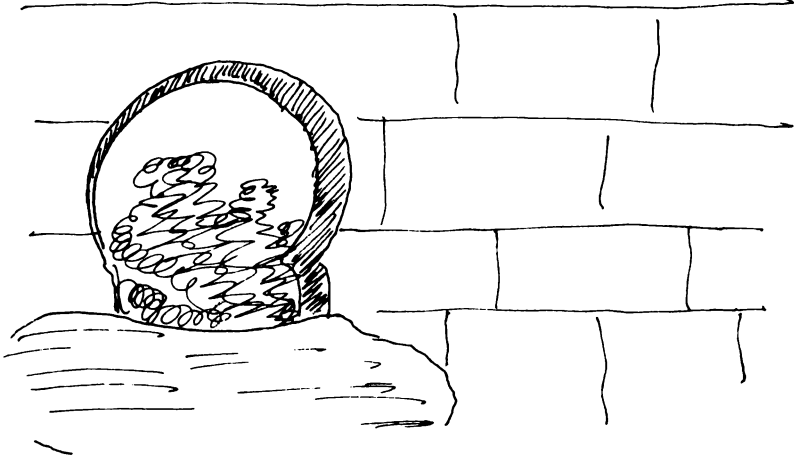
চারদিকে শুধু 'নেই' আর 'নেই'। হাউজঘিরে সবুজ শ্যামল লতাগুল্মের যে দৃষ্টিনন্দন ছড়াছড়ি ছিলো, তাও এখন রূপ নিয়েছে আবর্জনায়। ফুলে ফুলে ছেয়ে থাকা রাজসিক যে উদ্যানটা ছিলো– যা এঁকেবেঁকে দজলার তীর স্পর্শ করেছিলো– তাও আজ চোখে পড়ছে না।

সেই 'প্রমোদ-কানন',

সেই সৌন্দর্য বিলাস,

সেই স্থাপত্যশৈলী–

এখন যেনো এক ভীতিকর ভুতুড়ে বাড়ি!

সারা বাড়ি জুড়ে বসবাসযোগ্য একটা ছোট্ট কুটির দেখা গেলো। সেখানে গিয়ে যিয়াদ দেখতে পেলো– মাটিতে পাতা তেল চিটচিটে একটা বিছানায় ছেঁড়া তালিযুক্ত পোষাকে খালেদ হাসপাতালের রুগীর মতো শুয়ে আছে। যিয়াদ খালেদের এ করুণ অবস্থায়

'বিস্ময়মাখা' কণ্ঠে বললো–

'খালেদ! তোমার অবস্থা এতোটা খারাপ! কিছু লাগবে তোমার?'
যিয়াদ দৃশ্যত একটু ব্যথিতই হলো।
খালেদ বললো–
'হ্যাঁ, লাগবে!'

যিয়াদ ভাবলো, হয়তো খালেদ তার কাছে কোনো টাকা-পয়সা চাইবে। কিন্তু যিয়াদকে অবাক করে দিয়ে খালেদ বললো–
'তুমি এতোদিন কোথায় ছিলে? আসো নি কেনো? আমার জন্যে ভালো পোষাক কিনে আনো। আর আমাকে 'নাদা' (রোমান কণ্ঠশিল্পীর নাম)-র কাছে নিয়ে চলো!'

যিয়াদ খালেদের আবদারে ভীষণ অবাক হলো। বললো–
'খালেদ! তুমি এখনো তাকে ভুলতে পারো নি?'

'না! কোনোদিন ভুলতে পারবো না! আমি শুধু তাকেই চাই। তাকে পেলে পৃথিবীর আর কিছুই আমি চাই না। কেউ যদি আমার হারিয়ে যাওয়া সম্পদ ফিরিয়ে দেয় এবং তার সাথে আরো অনেক অনেক বাড়িয়ে দেয় আর বিনিময়ে আমাকে তার কাছে যেতে মানা করে, আমি তার মানা শুনবো না। আমি বাধা মানবো না। তার কাছে আমি যাবোই। সব ধন-দৌলত পেছনে ফেলেই! এক ঘন্টা তার সাক্ষাত ও সান্নিধ্যের চেয়ে দামী ও মূল্যবান আমার কাছে আর কিছুই নেই!'

খালেদের জন্যে যিয়াদের মনটা নরম হলো। সে খালেদকে 'হ্যাঁ' বললো। সাথে করে নিজের বাসভবনে নিয়ে গেলো। গোসলের পর তাকে মূল্যবান পোষাক পরতে দিলো। তারপর খাওয়া-দাওয়ার পর্ব

শেষ করে তাকে 'নাদা'র গানের আসরে নিয়ে রওয়ানা দিলো।

এদিকে 'নাদা' খালেদকে এ-সুন্দর বেশ-ভূষায় দেখে ভাবলো– খালেদের দিন বুঝি আবার ফিরে এসেছে! তাই তাকে দেখে সে এগিয়ে এলো। উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালো। তখন তার মুখে লেগেছিলো– আগের সেই যাদুমাখা মৃদু হাসি। ধনীর দুলাল শিকার করার এটিই তো সবচে' বড় হাতিয়ার! ডাইনীরা লোক-দেখানো ভদ্রতায়ও বেশ পটু হয়। তাই এতোদিন খালেদের সাথে দেখা না হওয়ায় সে একেবারে কাচুমাচু হয়ে দুঃখ প্রকাশ করে বললো–

'আমরা এখনো অবিচ্ছিন্নই। ঠিক আগের মতোই আমি তোমাকে ভালোবাসি। একদিনের জন্যেও তোমার কথা আমি ভুলে থাকতে পারি নি। কিন্তু 'একটা লোক' তোমার সাথে আমাকে দেখা করতে দেয় নি!'

কণ্ঠশিল্পীর চোখে অশ্রু! কিসের এ অশ্রু? ভালোবাসার না ছলনার? ছলনার অশ্রু! স্বার্থের অশ্রু! নতুন করে খালেদকে 'চিড়িয়া' বানানোর অশ্রু!

ভীষণ শক্তিশালী কিন্তু এ-অশ্রু! ছলনাময়ী নারীর এ-অশ্রু 'বীরপুরুষ'কেও কাবু করে ফেলে! যুদ্ধে যাওয়ার শ্রেষ্ঠ সময়ে যুদ্ধে যাওয়ার সঙ্কল্প ভুলিয়ে দেয়!

চোখের এ-অশ্রু আর বিনয়-নম্র এ-ব্যবহার দিয়ে কণ্ঠশিল্পী নিমিষেই খালেদকে কাবু করে ফেললো। জয় করে ফেললো খালেদের হৃদয়। খালেদের মনের আকাশে আবার উড়ালো প্রতারণা ও ছলনার কালো নিশান।

খালেদ ভীষণ প্রভাবিত হলো। খুশির বান ডেকে গেলো তার

হৃদয়ে। এ অভিনয়কেই সে প্রকৃত প্রেম ও হৃদয়টান মনে করে দ্বিতীয়বার ভুল করে বসলো। মুহূর্তেই সে ভুলে গেলো ভালোবাসার নামে কণ্ঠশিল্পীর অতীতের নিষ্ঠুরতার কথা। ছলে-বলে-কৌশলে তার সমস্ত সম্পদ হাতিয়ে নেয়ার কথা। চরম সঙ্কট সৃষ্টি করে চোরের মতো পালিয়ে যাওয়ার কথা।

সব প্রেমিকরাই বুঝি এমন হয়ে থাকে? এ-ময়দানে এসে প্রচণ্ড ধীমান ও বুদ্ধিদীপ্ত পুরুষেরাও বুঝি অমন কাবু হয়ে যায়– ছলনাময়ী নারীর মুখের হাসি আর চোখের অশ্রুর সামনে? তখন লোপ পেয়ে যায় কি তাদের বিচার-বিবেচনা ও আকল-বুদ্ধি?

আশ্চর্য! প্রেমিকার মুখ দিয়ে 'অসম্ভব' কিছু বের হলেও প্রেমিকরা তাকে 'সম্ভব' মনে করে বসে। এ কি ঘোরের বশে না সচেতন মনে? ঘোরের বশে! প্রেমিকার দেহ-সৌন্দর্য আর 'অশ্রু' নামের মহা শক্তিশালী অস্ত্রের ঘোরে!!

খালেদও সেই অস্ত্রের কাছে ধরাশায়ী হয়ে গেলো। ব্যর্থ হলো সে কণ্ঠশিল্পীর মিথ্যা অভিনয় ও ছলনা বুঝতে। তাই একটু পরই সে নিজের বর্তমান দুরবস্থার কথা একে একে সব বলে দিলো 'নাদা'কে!

আর যায় কোথায়! সব শুনে সাথে সাথে কণ্ঠশিল্পীর চেহারা রাগে-ক্ষোভে একেবারে কালো হয়ে গেলো। সাথে সাথে সে মুখ থেকে খুলে ফেলে দিলো কৃত্রিম ভালোবাসার নিকাব। বিষাক্ত সাপের মতো ফণা তুলে অবজ্ঞাভরে খালেদের দিকে ধারালো দৃষ্টিবাণ নিক্ষেপ করে বললো–
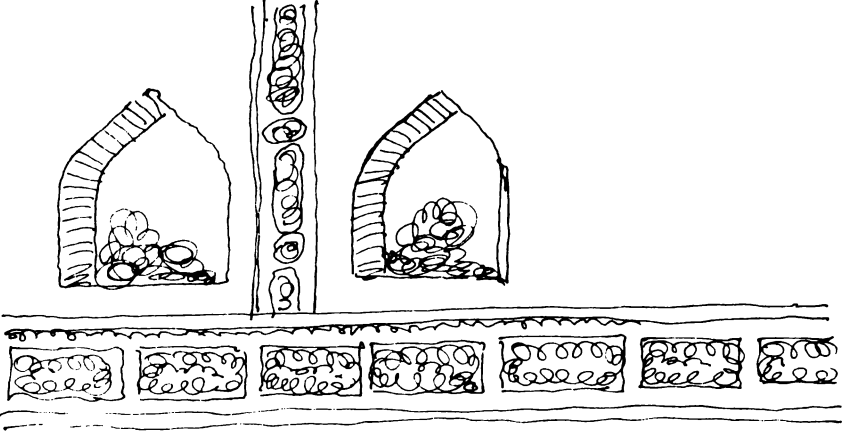
'খালেদ! ভিতরে থাকা তোমার ঠিক হবে না! 'সীতা' তোমাকে দেখে ফেলবে! তুমি ঐ জানালাটার পাশে গিয়ে দাঁড়াও। আমি জানালা দিয়েই একটু পর তোমার সাথে কথা বলছি!' খালেদ 'নাদা'র হঠাৎ পরিবর্তনে বেশ অবাক হলো। কিন্তু এখনো তার ঘোর কাটলো না। বোকার মতো বেরিয়ে এসে ঐ জানালাটার নীচেই ও দাঁড়ালো! অপেক্ষা করতে লাগলো কণ্ঠশিল্পীর উদয়ের! ঠিক যেমন 'রোমিও' দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতো–

'জুলিয়েট'-এর! একটু পর কণ্ঠশিল্পী এলো! উদিত হলো! কিন্তু অমন রুদ্রমূর্তি যে! যেনো সে খালেদকে চিবিয়ে খাবে! ঠিক যেনো একটা ডাইনী ও রাক্ষুসী!! তারপর কী হলো? তারপর আর কী হবে?

সেই ডাইনী রান্নাঘর থেকে নিয়ে আসা ভীষণ টগবগে 'গরম ঝোল' ঢেলে দিলো খালেদের মাথায়– জানালা দিয়ে!! তখনও হাসছিলো ডাইনী কণ্ঠশিল্পীটা! কিন্তু এ-হাসি চরম বিদ্রূপের!

দিন বদলের দিন এসেছে!

খালেদ এবার প্রচণ্ড হোঁচট খেলো।
এবার কি জ্বলে উঠবে খালেদের ঘুমন্ত বিবেক?
হ্যাঁ, ঐ তো জ্বলে উঠেছে!

এ আচরণে, এ ছলনায়, এ প্রতারণায়–
খালেদের দু'চোখে নেমে এলো অশ্রুর ধারা।
সিংহের হুঙ্কার ছেড়ে 'বীর খালেদ' এবার বললো–

'যিয়াদ! আমার এ অবস্থার জন্যে তুমি, তুমি শুধু তুমিই দায়ী! আমি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে ঘোষণা করছি– আমি তাওবা করলাম! আমি এখন ফিরে যাচ্ছি আমার আল্লাহ্র কাছে! আমার মাওলার কাছে! আমার তাওবা কবুলকারী মাওলার কাছে! আজ থেকে, এ-মুহূর্ত থেকে সমস্ত সম্পর্ক আমি ছিন্ন করলাম পাপের সাথে, অপরাধের সাথে! তোমাদের মতো নরপশুদের সাথে!!'

যিয়াদ এ-কথা শুনে হাসলো–
উপহাসের হাসি,
বিদ্রূপের হাসি।
কদাকার নোংরা হাসি।
আর বললো–

'এখন তোমাকে কে আর জিজ্ঞাসা করে? সবার কাছেই এখন তুমি বিদ্রূপের পাত্র। আমার মনে হয়, তোমার তাওবা-টাওবাও এখন কোনো কাজে লাগবে না! হা .. হা .. হা!'

খালেদ যিয়াদের বিদ্রূপের কোনো উত্তর করলো না। একটু আগে তার দেয়া পোষাক তার সামনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নিজের জীর্ণ

পোষাকেই হাঁটা ধরলো বাড়ির দিকে! বীরের মতো দৃপ্ত পদে! এই খালেদের সাথে আগের খালেদের কোনো মিল নেই!! দিন বদলের দিন কি এখান থেকেই শুরু?

হ্যাঁ, এখান থেকেই শুরু!

এরপর খালেদের জীবনে কী ঘটলো? এরপর খালেদের জীবন একদম বদলে গেলো! সে বদলে যাওয়ার গল্প আমি আর বলছি না। তবে বলার জন্যে হাজির করছি সবচে' বড় 'আসামীকে'ই। হ্যাঁ, যিয়াদ! যিয়াদই এখন খালেদের বদলে যাওয়া জীবনের কাহিনীটা বলবে–

'সেদিন যে খালেদ তাওবার বীরোচিত ঘোষণা দিয়ে বেরিয়ে গেলো, তারপর থেকে অনেক দিন পর্যন্ত তার সাথে আমার দেখা নেই। অনেক দিন মানে একেবারে পনের বছর। এর মধ্যে আমি একবারের জন্যেও তার খোঁজ-খবর নিই নি। নেয়ার প্রয়োজন মনে করি নি। কাউকে তার কথা জিজ্ঞাসাও করি নি। এমন কি তার কথা আমি ভাবিও নি।

একদিন আমি 'বাবে খোরাসান' (খোরাসান প্রবেশদ্বার)-এর কাছে দাঁড়িয়েছিলাম। সেখানে এক মসজিদে অনেক লোক-সমাগম দেখলাম। এখন তো নামাজের সময় না! তাহলে মসজিদে এতো ভিড় কেনো? কৌতূহলবশত আমি এগিয়ে গেলাম। কাছে গিয়ে দেখলাম– বিরাট এক দ্বীনি মাহফিল। সবাই একজনকে মধ্যমণি বানিয়ে গোল হয়ে বসে আছে। তিনি অত্যন্ত আবেগমাখা ভাষা ও কণ্ঠে বক্তৃতা করছিলেন। বিষয়বস্তু ছিলো– তাওবার ফজিলত ও মাহাত্ম্য। আমি যখন উপস্থিত হই, তখন তিনি কুরআনের এ

আয়াতের ব্যাখ্যা করছিলেন–

'আপনি ঘোষণা করুন (হে রাসূল)! হে আমার বান্দারা! তোমরা যারা (গোনাহ করে করে) নিজেদের প্রতি অবিচার করে ফেলেছো, আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না! তিনি তো সমস্ত গোনাহ্-ই মাফ করে দেন! (কারণ) তিনি ক্ষমাশীল দয়ালু।'

- সূরা যুমার, আয়াত- ৫৩

তাঁর এ-ভাষণ আমার হৃদয়কেও ছুঁয়ে গেলো। সাথে সাথে আমার পাপেভরা অতীত কথা বলে উঠলো! কী না করেছি আমি? আমার গোনাহ্ও আল্লাহ্ মাফ করবেন? আমার পাপের যে কোনো সীমা নেই! আমার অপকর্মের যে কোনো মাত্রা নেই! ..

অতীত কুকর্মের ছবিগুলো একে একে আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। বিশেষ করে 'খালেদ' নামের ছেলেটাকে আমি তো একেবারে ধ্বংসই করে ছেড়েছি! জানি না, ও এখন কেমন আছে, কোথায় আছে!

আমি অনুতাপ-দগ্ধ হতে হতে গিয়ে বসলাম সেই তাওবার মজলিসে। অন্ধকার অতীতের জন্যে লজ্জায়-অনুশোচনায় আমার মনটা কেবল হাহাকার করছিলো, মাতম করছিলো। আমি অনুশোচনার অশ্রু ধরে রাখতে পারলাম না। অশ্রুতে আমার দাড়ি ভিজে গেলো। তাঁর বয়ান শুনে উপস্থিত লোকজন দলে দলে তাওবা করছিলো। অশ্রুভরা চোখে সবাই আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছিলো। আহ! সবার সে কী কান্না! তাওবা করার, আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে যাওয়ার এমন কান্নাময় দৃশ্য জীবনে আর কখনো দেখি নি আমি! এমন বিষয়ের এমন বয়ানের এমন মাহফিলে–
কোন্ গোনাহগার নিজেকে ধরে রাখতে পারে?

কে ছুটে যাবে না আল্লাহ্‌র দিকে,
তাওবাকবুলকারী মহান 'গাফূর'-এর দিকে?
এখানে তো পাপী-তাপী 'নীরবে' বসে থাকতে পারে না?
তাকে যে সাড়া দিতেই হবে!
বিশেষত এ-আয়াত শোনার পরে!
হোক না পাপেঢাকা তার ছোট্ট জীবন?

'আপনি ঘোষণা করুন (হে রাসূল)! হে আমার বান্দারা! তোমরা যারা (গোনাহ্ করে করে) নিজেদের প্রতি অবিচার করে ফেলেছো, আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না! তিনি তো সমস্ত গোনাহ্-ই মাফ করে দেন! (কারণ) তিনি ক্ষমাশীল দয়ালু।'

- সূরা যুমার, আয়াত- ৫৩

আমার মনও কথা বলে উঠলো। এই প্রথম আমি হৃদয়ে সত্যের দিকে, কল্যাণের দিকে, আলোর দিকে ফিরে যাওয়ার তীব্র টান অনুভব করলাম।

মজলিস খতম হওয়ার পর আমি সেই বুযুর্গের কাছে গিয়ে বসলাম। তিনি তখন রুমাল দিয়ে অশ্রু মুছছিলেন। নিচের দিকে তাকিয়ে কী যেনো ভাবছিলেন। কী সুন্দর দীপ্তিময় মুখমণ্ডল! যেনো নূরে নূরে ছাওয়া! আলোয় আলোয় ভাসা! সোনালী রূপালী দীপ্তিতে স্নাত। যেনো বসে আছে মানুষের বেশে এক নূরানি ফেরেশতা।

আমি বেশিক্ষণ তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকতে পারলাম না, দৃষ্টি নামিয়ে নিলাম। হয়তো লজ্জায়। ক্ষণিকের দৃষ্টিতেই মনে হলো– তাঁকে যেনো আমি চিনি! কোথায় যেনো এর আগে তাঁকে দেখেছি! দূরত্ব বজায় রেখে আমি বারবার তাঁর দিকে তাকাচ্ছিলাম– সন্ধানী দৃষ্টিতে। হাতড়ে বেড়াচ্ছিলাম স্মৃতিভাণ্ডার। হ্যাঁ, আমার স্মৃতির

বিশাল সঞ্চয়ে– থেকে-থেকে এ-চেহারাটি ভাসছে আর ডুবছে, বারবার। তাহলে কি আমি তাঁকে সত্যি চিনি! চোখটা বন্ধ করলাম।

আমার স্মৃতির ডায়রি থেকে একটা একটা করে পাতা উল্টাতে লাগলাম। এক জায়গায় এসে থেমে গেলাম। চোখ খুলে ফেললাম! আবার তাঁর দিকে তাকালাম! হ্যাঁ, এই তো, এই যে স্মৃতি আমাকে ধরা দিচ্ছে! ইনি খালেদ নন তো! দাড়িটুকু বাদ দিলে যে একেবারে অবিকল খালেদের চেহারা! হ্যাঁ, ইনি খালেদই হবেন! ঐ যে আজ থেকে পনের বছর আগে আমাকে তিরস্কার করতে করতে খালেদ চলে এসেছিলেন তাণ্ডবার ঘোষণা দিয়ে, ঐ খালেদই এই খালেদ! বদলে যাওয়া খালেদ!

আমার মন আমার অজ্ঞাতে বলতে লাগলো– 'যিয়াদ! পরিচয় দিয়ো

না! খালেদের যে ক্ষতি তুমি করেছো– ক্ষমা পাওয়া অসম্ভব!'

আমি মনের কথা শুনলাম না। খালেদের সামনে নিজেকে পেশ করার সিদ্ধান্ত নিলাম! ভয় কী! আমিও তো একটু আগে তাওবার মুনাজাতে 'আমীন! আমীন!' বলেছি! আল্লাহ কি আমার 'আমীন আমীন' ডাক শুনবেন না?

বিস্ময়মাখা চোখে আমি খালেদের দিকে তাকিয়ে রইলাম! তাকিয়েই রইলাম! একটু পর খালেদ উঠে গেলেন!
এখন আমি খালেদকে আর তুমি বলতে পারছি না। আপনি করে বলতে হবে। কারণ খালেদ এখন অনেক উপরে চলে গেছেন!

দেখলাম অনেকেই খালেদের পেছনে পেছনে যাচ্ছে। আমিও সবার সঙ্গে চললাম, একটু দূরত্ব বজায় রেখে। চলতে চলতে খালেদ সেই পুরোনো প্রাসাদে গিয়ে প্রবেশ করলেন। যে প্রাসাদে আগে আমি অসংখ্যবার যাতায়াত করেছি। আগের আসায় আর আজকের আসায় কতো পার্থক্য! লজ্জায় আমার মাথা নুইয়ে আসছিলো। তাঁর সাথে সবাই ভিতরে প্রবেশ করলো। আমিও। যেনো যন্ত্র-চালিত হয়ে।

বাড়িটি ইতিমধ্যে বেশ সংস্কার করা হয়েছে। ছোট ছোট অনেক ঘর নির্মাণ করা হয়েছে। দেখলাম– প্রতিটি ঘর থেকেই ভেসে আসছে কুরআন তিলাওয়াতের মিষ্টি সুর। ছাত্রদের কিতাব পাঠের মৃদু ও মধুময় গুঞ্জন। আমি অবাক হয়ে গেলাম! খালেদ বদলেছে, সে তো দেখতেই পাচ্ছি! কিন্তু এতো বদলেছে! খালেদের বদলে যাওয়ার কাহিনী শোনার জন্যে আমার অস্থির মনটা আঁকুপাকু করতে লাগলো।

বুঝতে পারলাম, খালেদের প্রাসাদ এখন একটি পরিপূর্ণ মাদ্‌রাসা। সব ঘরেই তালিবে ইলম-এর জামাত থাকে। ছোট্ট একটা ঘরে খালেদ নিজে থাকেন। সুন্দর পরিপাটি। সেখানে যেনো আলোকধারা ছুটে চলেছে! সেই ঘরটাতেই খালেদ এখন সবাইকে নিয়ে বসেছেন। আমিও সবার সঙ্গে বসে আছি। একটু পরই দেখলাম–খালেদ আমার দিকে তাকিয়েছেন। আমি বড়ো অসহায়বোধ করতে লাগলাম। খালেদ কি আমাকে চিনে ফেলেছেন? মনে হয় না! এখন তো আমি একেবারে বুড়োদের কাতারে চলে এসেছি। আগের সাথে এখন আমার কোনো মিল নেই।

আমি বিনীতভাবে তাঁকে জানালাম– 'একটু আগে আমিও তাঁর মাহফিলের একজন নগণ্য শ্রোতা ছিলাম!' খালেদ আমাকে সাদরে গ্রহণ করলেন। এ পর্যন্ত আসার জন্যে ধন্যবাদ জানালেন।

এরপর নিজের পরিচয়টা আর গোপন রাখা ভালো মনে হলো না। এক সুযোগে তাঁর কানে কানে নিজের পরিচয় বলে দিলাম! আরো জানিয়ে দিলাম– 'আমি আর আগের সেই যিয়াদ নই! একটু আগে আমিও তাঁর তাওবার মাহফিলে বসে তাওবার অশ্রু দিয়ে অতীতের পাপগাথা সব ভাসিয়ে দিয়ে এসেছি!! এখন আবার আমি তাঁর হাতে 'বিশেষভাবে' তাওবা করতে চাই!!

তখন খালেদ আমাকে বকলেন না। কোনো কটু কথাও বললেন না। শুধু আস্তে আস্তে বললেন– 'যিয়াদ! তোমাকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি!'

আমি সবার সাথে বসে খেলাম। খাওয়া-দাওয়ার পর সবাই চলে গেলো। শুধু আমি রয়ে গেলাম। খালেদের সামনে একা একা বসে

থাকতে আমার খুব কষ্ট হচ্ছিলো। বারবার অতীত-স্মৃতি এসে আমাকে কষ্ট দিচ্ছিলো। আমার চোখ থেকে দরদর করে পানি বের হতে লাগলো। মাথা উঠিয়ে দেখলাম– খালেদও কাঁদছেন। একটু পর চোখের পানি মুছে আমাকে লক্ষ্য করে বললেন– 'আল্লাহ তোমার তাওবা কবুল করুন! আমাদের সকলের তাওবা কবুল করুন!'

খালেদের দু' জীবনের চিত্রই তো আমার সামনে আছে! কিন্তু এ নতুন জীবনের চিত্র আমার কাছে অন্যরকম মনে হচ্ছে। খালেদকে আমার কাছে মনে হচ্ছে– একটা তাজা গোলাপ। তাঁর টলটলে অশ্রুর দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে– না, খালেদ শুধু গোলাপ না, শিশিরশুভ্র গোলাপ। তাঁর তাওবার ডাকে সাড়া দিতে পেরে নিজেকে বড়ো ধন্য মনে হলো। আমি রুমাল দিয়ে চোখের পানি মুছে তাঁর দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালাম। আমার ভীষণ ইচ্ছে হচ্ছিলো– তাঁকে জিজ্ঞাসা করি, কী করে আপনার জীবন এতো সুন্দর হলো? এতো বদলে গেলো? একটু শোনাবেন আমাকে– আপনার বদলে যাওয়া জীবনের ছন্দময় কথা?

কিন্তু আমাকে মুখের ভাষায় কিছুই বলতে হলো না। আমার চোখের ভাষাই তিনি পড়ে ফেললেন এবং তাঁর বদলে যাওয়া জীবনের সূচনা-কাহিনী, মধ্য-কাহিনী এবং বর্তমান-কাহিনী– সব শোনাতে লাগলেন। সূচনাটা ছিলো এভাবে–

'যিয়াদ! তোমার কি মনে পড়ে সেই নষ্ট নারীর নষ্ট ব্যবহারের কথা? আমি ভীষণ ব্যথা পেয়েছিলাম সেদিন। আল্লাহকে সাক্ষী রেখে সেদিনই আমি তাওবা করেছিলাম খাঁটি মনে। ঘৃণায় আমি তোমার পোষাক ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। তখন আমার খুবই দূরবস্থা। বাড়ি

এলাম বুকভরা দুঃখ-বেদনা নিয়ে। থাকতে চেষ্টা করলাম বাড়িতেই। কিন্তু পারলাম না। কিছুতেই মন টিকছিলো না। মনে হচ্ছিলো, বাড়িতে বেশিক্ষণ থাকলে একটু পরই আমি দম বন্ধ হয়ে মারা যাবো। বেরিয়ে পড়লাম। হাঁটতে লাগলাম উদ্দেশ্যহীনভাবে। হাঁটতে হাঁটতে সেই মসজিদটার সামনে এসে থামলাম, যেখানে একটু আগে মজলিস বসেছিলো। এর আগে আমার কখনোই মসজিদে যাওয়া হয় নি। মসজিদে তখন নূরানি চেহারার এক আলিমে দ্বীন লোকজনকে কুরআনের তালিম দিচ্ছিলেন। কী ভেবে যেনো আমি সেখানে উপস্থিত হলাম। বসলাম সবার পেছনে। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। তবু মনে হলো, কুরআন তিলাওয়াতের আওয়াজ যেনো আমার কানে মধু ঢালছে। ভীষণ ভালো লাগছিলো আমার। মনে হচ্ছিলো, ধীরে ধীরে আমার ব্যথিত, অশান্ত মনে যেনো অদ্ভুত প্রশান্তি নেমে আসছে।

মজলিস শেষ। ছাত্ররা যে যার মতো উঠে চলে যেতে লাগলো। আমি তখনো বসে আছি। কোথায় যাবো, কী করবো– কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। অমনি ঐ বুযুর্গের সাথে আমার চোখাচোখি হয়ে গেলো। দেখলাম– তিনি নিথর দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। তিনি হাতের ইশারায় আমাকে কাছে ডাকলেন। জানি না, সে ডাকে কী আকর্ষণ ছিলো। মনে হলো আমার আব্বু যেনো মায়া করে আমাকে ডাকছেন। আমি তাঁর কাছে গিয়ে সংকুচিত হয়ে বসলাম। কিন্তু মুহূর্তেই তিনি আমার সংকোচ দূর করে ফেললেন। কী এক আকর্ষণে যেনো আমাকে তিনি তাঁর হৃদয়েরও অনেক কাছে টেনে নিলেন। তিনি যখন বললেন–

'বাবা! তুমি কে? কোত্থেকে এসেছো? তোমাকে এতো বিষণ্ন লাগছে

কেনো?'

উত্তরে আমি ঝরঝর করে কেঁদে ফেললাম। তিনি বুঝতে পারলেন– আমি আঘাত-পাওয়া এক উদ্ভ্রান্ত যুবক। আমাকে তিনি স্নেহঝরা কণ্ঠে বললেন–

'বলো বেটা, বলো! কী হয়েছে তোমার? কেনো তোমার চোখ কাঁদছে! মুখ কাঁদছে! কথা বলতে পারছো না!'

আমি আমার উদ্গত কান্না সংবরণের চেষ্টা করলাম। চোখ মুছতে মুছতে আমি তাঁকে একে একে ঘটে যাওয়া সব বলে দিলাম! তিনি কুরআনের অনেক আয়াত এবং হাদীসের অনেক উদ্ধৃতি শুনিয়ে আমাকে সান্ত্বনা দিলেন।

এরপরের ঘটনাবলী সত্যি অকল্পনীয়! তিনি আমাকে আর ছাড়লেন না। একেবারে কাছে টেনে নিলেন। আমি যেনো তাঁরই সন্তান! তাঁর নিজের বাড়ির পাশে মসজিদের কাছে আমার থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। তাঁর অনুগ্রহের বৃষ্টিতে আমি স্নাত হতে লাগলাম। দিনের পর দিন। তিনি তাঁর প্রচুর ইলম আর অল্প মাল দিয়ে আমাকে ধন্য করতে লাগলেন। আমি প্রচণ্ড পিপাসা নিয়ে তাঁর কাছে ইলম হাসিল করতে লাগলাম। অল্প ক'দিনেই সহপাঠীদের ছাড়িয়ে গেলাম। এক সময় আমিই হয়ে গেলাম মুযাকারা (এক সঙ্গে বসে পেছনের পড়া বা সবক পুনরালোচনা করা)-এর যিম্মাদার (দায়িত্বশীল)।

এরপর তিনি আমাকে এক বড় ব্যবসায়ীর সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তিনি আমাকে পিতার আদর ও স্নেহ দিয়ে খুব যত্ন করে শিখিয়ে দিলেন ব্যবসার ইসলামী নিয়ম-কানুন ও পদ্ধতি। যে আগ্রহ নিয়ে আমি ইলম শিখেছিলাম, সে আগ্রহ নিয়ে এবার আমি ব্যবসাও শিখলাম।

এরপর আমার শায়খ ও শিক্ষক তাঁর এক সুহৃদকে বললেন– আমাকে এক হাজার দিরহাম ঋণ দিতে। সে ঋণ হাতে পেয়ে আমি সাথে সাথে তা ব্যবসায় খাটালাম। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে অল্প দিনেই আমি লাভের দিন দেখলাম। কিছুদিনের ভিতরেই আমি ঋণ পরিশোধ করে দিলাম। এরপর আমাকে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয় নি। একের পর এক লাভের দরোজাগুলো খুলে যেতে লাগলো। আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতায় আমার মাথা বারবার নুইয়ে এলো। কতো মেহেরবান তিনি! কতো দয়ালু তিনি!

কিছুদিনের মধ্যেই আমার কাছে বেশ অর্থকড়ি জমা হয়ে গেলো। আমার মহান শিক্ষক আমাকে আরো কাছে টানলেন। তাঁর স্নেহের শীতল ছায়ায় আমাকে স্থায়ীভাবে জায়গা করে দিলেন। তাঁর মেয়ের সাথে আমার বিবাহ সম্পন্ন হয়ে গেলো। ও ছিলো রূপে-গুণে এক শ্রেষ্ঠ নারী। ওর ঔরষে জন্ম লাভ করেছে আমার ছেলে ও মেয়ে। সবই আল্লাহ্‌র দান ও করুণা।

এরপর আমি হাত দিলাম আমার আব্বুর স্মৃতি জড়ানো পুরোনো সেই প্রাসাদটি সংস্কারের কাজে। সংস্কারের পর অবশ্য সেই জমকালো প্রাসাদ আর প্রাসাদ থাকলো না, মাদরাসা হয়ে গেলো। আর আমি নিজে থাকার জন্যে এ-ঘরটিকেই বেছে নিলাম।

পেছনে ফেলে আসা দিনগুলোর কথা এখনো আমার মনে পড়ে। তখন হৃদয়ের গভীর থেকে উচ্চারণ করি– আল-হামদুলিল্লাহ! কারণ আমি এখন আল্লাহ্‌র অসংখ্য নেয়ামতের ভিতরে ডুবে আছি। এর মধ্যে সবচে' বড় নেয়ামত হলো– আমি এখন নকল ভালোবাসা এবং প্রকৃত ভালোবাসার রহস্য ও স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে সক্ষম

হয়েছি। আমি কুকুরের মতো সেই রমণীর পেছনে ঘুরঘুর করেছি। তখন আমি ছিলাম তার ইচ্ছার গোলাম। তার চোখের ইশারায় কয়েক দিনেই লক্ষ লক্ষ দিরহাম খরচ করে ফেলেছি, যা একজন মানুষ যুগব্যাপী পরিশ্রম করেও কামাই করতে পারে না।

আমি ছিলাম দৃষ্টিহীন। আল্লাহ আমার দৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়েছেন। তখন সূর্যের আলো, চাঁদের জোছনা, পুষ্পের শোভা– সবই আমি নতুনরূপে দেখতে পেলাম। বরং এ সবের চেয়েও যা অধিক সুন্দর ও রূপময় এবং উপকারী ও শ্রেষ্ঠ– তাও দেখতে পেলাম। আর তা হলো ইলম, ইলমে ওহী। কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান। আমার কাছে প্রিয় হয়ে উঠলো এ-ইলমের মজলিস দুনিয়ার সবকিছুর চেয়ে অনেক অনেক বেশী। যখন আমি আল্লাহ্‌র যিকিরে বসি, তখন আমার কাছে মনে হয়– আমি যেনো জান্নাতের পাখি হয়ে উড়ছি। প্রশান্তিতে তখন আমার হৃদয় হর্ষ-ধ্বনি করে উঠে! আমি তখন অনুভব করি–

নতুন প্রাণ।
নতুন চেতনা।
নতুন সজীবতা।
নতুন দীপ্তি।

এখন আমি হালাল পথে উপার্জন করি। সে পথেই চলি, যে পথ আল্লাহ্‌র ওলী ও বুযুর্গদের পথ। যে পথ সকল পথের চেয়ে শ্রেষ্ঠ পথ। অথচ আমি আগে চিনতাম শুধু সেই নারীর গৃহে যাতায়াতের পথ।

আজ আমি ভালোবাসার রহস্য বুঝতে পেরেছি। আজ আমার কাছে স্পষ্ট ধরা পড়েছে– প্রেমিকরা আসলে অন্ধ, মহা অন্ধ। কেননা

তাদের হৃদয় মরে যায়। চিন্তা মরে যায়। সুকুমারবৃত্তি মরে যায়। এ-অন্ধ প্রেমিকরা পৃথিবীতে প্রেমিকাদের 'রূপ' ছাড়া আর কিছুই বিচার করে দেখতে চায় না। প্রেমিকাদের কণ্ঠস্বর ছাড়া আর কোনো কণ্ঠই তাদের পছন্দ হয় না।

প্রেমিকরা স্পন্দনহীন, অচল। প্রেমিকাদের বাড়ির পথ মাড়ানো ছাড়া অন্য কোনো পথেই তারা চলতে পারে না।
তারা ক্ষুধাকে হাসিমুখে বরণ করে নেয়, প্রেমিকারা তৃপ্তিভরে খাবে বলে। তারা ঘুমকে হারাম করে দেয়– প্রেমিকারা চোখভরে ঘুমাবে বলে।
তারা দারিদ্র্যকে কাছে টেনে নেয়– প্রেমিকাদের সুখের জীবন, আনন্দের জীবন কামনা করে। তারা অসুস্থতাকেও স্বাগতে জানাতে প্রস্তুত, শুধু প্রেমিকাদের সুস্থতার স্বপ্নে বিভোর হয়ে। তাদের নিজস্ব কোনো চাওয়া-পাওয়া থাকে না। প্রেমিকাদের চাওয়া-পাওয়ার ভিতরে হারিয়ে যায় তাদের সকল চাওয়া-পাওয়া।
তাদের চিন্তা-চেতনা ও ধ্যান-ধারণা বিলুপ্ত হয়ে যায় প্রেমিকাদের চিন্তা-চেতনা ও ধ্যান-ধারণার সামান্য ইশারায়। অর্থাৎ দুনিয়ার এই প্রেমিকরা প্রেমিকাদের ভিতরে এমনভাবে বিলীন হয়ে যায় যে, তাদের আলাদা কোনো সত্ত্বা ও অস্তিত্বই থাকে না।

আমি এখন হারিয়ে যাওয়া অস্তিত্বের সন্ধান পেয়েছি। ফিরে এসেছে আমার কাছে আমার প্রিয় স্বাধীনতা। আমার মুক্ত ইচ্ছা। আমার দৃষ্টি থেকে সরে গেছে আচ্ছন্নময়তার পর্দা। নষ্ট ভালোবাসায় সময় নষ্ট করার অসারতা। এখনো আমি ভালোবাসি। কিন্তু আমার স্ত্রীকে। আমার স্ত্রীই আমার ভালোবাসার রানী। আমার সন্তান-সন্ততিই আমার ভালোবাসার ধন। এ-ভালোবাসা স্বর্গীয়

জ্যোতিস্নাত। উচ্ছল ঝরনা প্রবাহের মতো গতিশীল ও স্বচ্ছ।

আগে আমি পয়সা উড়াতাম অন্যায়ের পথে– প্রবৃত্তির হুকুমের দাস হয়ে। ফলে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলাম–
প্রাসাদ থেকে কুঁড়ে ঘরে।
আলো থেকে অন্ধকারে।
প্রাচুর্য থেকে দারিদ্র্যে।
ফুলবাগান থেকে কাঁটাবনে।
প্রাপ্তি থেকে বঞ্চনায়।
কিন্তু যখন আমি তাওবা করলাম, ফিরে এলাম আমার আল্লাহ্‌র কাছে, আমার রব-এর কাছে, তখন তিনি আমাকে আবার ফিরিয়ে আনলেন–
কুঁড়ে ঘর থেকে 'প্রাসাদে'।
অন্ধকার থেকে আলোতে।
দারিদ্র্য থেকে প্রাচুর্যে।
কাঁটাবন থেকে ফুল বাগানে।
বঞ্চনার হাহাকারযুক্ত পৃথিবী থেকে প্রাপ্তির সোনালী দিগন্তে।
ফিরে এলো আমার সব আলো, সব ভালো।
বিদায় নিলো আমার উপর জেঁকে বসা সব কালো।
আরো পেলাম পুরস্কার হিসাবে কতো কী নেয়ামত!
আমি এখন ভাসছি সে নেয়ামতের শীতল স্রোতধারায়।
আশা করি, পরকালেও আমার আল্লাহ্ আমাকে সুখ-শান্তির শ্রেষ্ঠ ও শেষ ঠিকানা– জান্নাতে একটু ঠিকানা দেবেন। তাঁর দরবারে এখন এই আমার দিবস-রজনীর একমাত্র মুনাজাত!'

বলতে পারো, অতীতের কোন্ স্মৃতিটা মানুষকে সবচে' বেশি হাতছানি দিয়ে ডাকে, ডেকেই চলে অবিরত? জানি না, উত্তরে তুমি কী বলবে। তবে আমার মতে- সে হলো দাদী'র গল্পের আসর! আহা! কী মধুময় সেই স্মৃতি!! শৈশবকালে দাদী'র কাছে গল্প শোনার সেই গাল-ফোলানো ও কপাল-কুঁচকানো বায়নার কথা- কে ভুলতে পারে?..

শিশু হয় কিশোর, তারপর পরিণত যুবক। তখনও সে ভুলতে পারে না চাঁদনি রাতের মায়াবী জোৎস্নায় দাদী'র গল্পের আসরের সেই স্মৃতি। বয়স বাড়ার সাথে সাথে বাড়তে থাকে গল্পের প্রতি তার এই ঝোঁক ও আকর্ষণ। তার কেবলই ছুটে যেতে ইচ্ছে করে- সেই হারানো শৈশবে, মাদুরপাতা উঠানে, দাদী'র কাছে, চাঁদনি রাতের সেই গল্পের আসরে!

পাঠক! আমার বড়ো কষ্ট লাগে যখন গল্পের প্রতি শিশু-কিশোরদের এই ঝোঁক ও আকর্ষণকে আমরা কাজে লাগাতে ব্যর্থ হই। আর আমাদের ব্যর্থতায় দুশমনরা আমাদের গল্পপ্রিয় শিশু-কিশোরদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়-গল্প নামের বিষ! আমাদের এই গাফিলতির জন্যে আল্লাহ কি আমাদেরকে ক্ষমা করবেন?

হ্যাঁ পাঠক! এই দায়বোধ থেকেই আমি প্রিয় শিশু-কিশোর বন্ধুদের জন্যে লিখেছি এই গল্প সিরিজ— ইতিহাসের সত্য কাহিনী অবলম্বনে। ইতিহাসকে অবিকৃত ও অক্ষুণ্ন রেখে শুধু গল্পের জামাটা পরিয়ে দিয়েছি ইতিহাসের গায়ে।

-আলী তানতাভী

ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলা বাজার, ঢাকা